بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অনুপম আদর্শ প্রসঙ্গে খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন, বিগত সফরের আগে আমি মহানবী (সা.)-এর যেসব সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলাম। আজ থেকে পুনরায় সেই বিষয় শুরু হবে। আজ যাদের স্মৃতিচারণ করা হবে তাদের একজন হলেন হযরত উমারা বিন হাযম (রা.)। তিনি সেই ৭০জন সাহাবীর একজন যারা আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন। তার ভাই হযরত আমর বিন হাযম ও মা'ওয়ার বিন হাযম (রা.)-ও সাহাবী ছিলেন। বদর, উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন বনু মালেক বিন নাজ্জারের পতাকা উমারার হাতে ছিল। মহানবী (সা.) তার সাথে হযরত মুহ্‌রাস বিন নাযলা (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তার মাতার নাম খালেদা বিনতে আনাস। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুরতাদদের সাথেও লড়াই করেন ও ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

একবার আব্দুল্লাহ্ বিন সাহল (রা)-কে সাপে কাটলে মহানবী (সা.) তাকে হযরত উমারা বিন হাযমের কাছে নিয়ে যেতে বলেন যেন তিনি তাকে দম করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। সাহাবীরা বলেন, তার অবস্থা তো একেবারেই সংকটাপন্ন। মহানবী (সা.) বলেন, উমারার কাছে নিয়ে যাও, সে দম করলে আল্লাহ্ আরোগ্য দান করবেন। এভাবে দম করা তাকে মহানবী (সা.)-ই শিখিয়েছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে মহানবী (সা.) দম করতে পারতেন না; বরং তিনি (সা.) একেক জনকে একেক কাজের জন্য দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন, তাই এমনটি করতে বলেছিলেন।

মসজিদে নববীতে মুনাফিকরা আসত এবং হাসি-ঠাট্টা করত। একদিন মহানবী (সা.) তাদের কয়েকজনকে কানাঘুষা করতে দেখে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে বলেন। হযরত আবু আইয়ুব ও উমারা তাদের বের করে দেন। তাবূকের যুদ্ধে যাবার পথে মহানবী (সা.)-এর উট কাসওয়া হারিয়ে যায়। তখন যায়েদ নামের এক মুনাফিক, যে হযরত উমারার উটের দেখ-ভালের দায়িত্বে ছিল, গোবেচারা ভাব করে বলে বসে, 'মুহাম্মদ (সা.) না অদৃশ্যের খবর জানার ও অন্যদেরকে জানানোর দাবী করেন? তার নিজের উট কোথায় তা জানেন না?' আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এসব কথা ও উটের সন্ধান জানিয়ে ইলহাম করেন এবং তিনি (সা.) এসে সকলকে তা বলেন এবং এ-ও বলেন, 'আমি নিজে থেকে অদৃশ্যের খবর জানার দাবী কখনোই করি নি, আল্লাহ্ যা জানান কেবল ততটুকুই জানি। হযরত উমারা যখন জানেন, যায়েদ এসব কথা বলেছে, তখন তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। মহানবী (সা.) থেকে উমারা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, চারটি এমন বিষয় রয়েছে, সেগুলো যে পালন করবে সে মুসলমান; আর যে এর একটিও ছেড়ে দেবে, বাকিগুলো তার কাজে আসবে না। এগুলো হল নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ। হুযুর (আই.)

বলেন, এটি হল মুসলমানের সংজ্ঞা, অথচ তথাকথিত আলেমরা এর বাইরে গিয়ে কুফরি ফতোয়া দেয়।

দ্বিতীয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.), পিতার নাম মাসউদ বিন গাফের ও মাতার নাম উম্মে আবদ, বনু হুযায়ল গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি একেবারে প্রথমদিকের মুসলমান ছিলেন, হযরত উমরের বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদের সমসাময়িক মুসলমান ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি ষষ্ঠ মুসলমান ছিলাম। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এরূপ— একদিন তিনি উকবা নামীয় একজনের ছাগপাল চরাচ্ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) ও আবু বকর সেখানে আসেন ও মহানবী (সা.) দুধ আছে কি-না তা জানতে চান। তিনি (রা.) বলেন, আছে, কিন্তু আমি যেহেতু আমানতের দায়িত্বে আছি, সেহেতু তা দিতে অপারগ। তখন মহানবী (সা.) এমন একটি ছাগল আনতে বলেন যা দুগ্ধবতী নয়, সেরকম ছাগল আসলে তিনি (সা.) সেটির স্তনে হাত বুলিয়ে দোয়া করেন এবং তা দুধে ভরে যায়। মহানবী (সা.) ও আবু বকর (রা.) তা থেকে পান করেন, এটি দেখে হযরত আব্দুল্লাহ্ ঈমান আনেন। তিনি সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছে থেকে কুরআনের ৭০টি সূরা মুখস্ত করেছেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর সেবক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর (সা.) সাহচর্যে থেকে অত্যন্ত বড় মাপের আলেম ও ফাযেলে পরিণত হন। হানাফী ফিকাহ্র ভিত্তি অধিকাংশ তারই বর্ণনাদির উপর। মহানবী (সা.) যে চারজন সাহাবীর কাছ থেকে অন্যদেরকে কুরআন ও ইসলাম শিখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাদের একজন হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ; বাকীরা হলেন সালেম, মুআয বিন জাবাল ও উবাই বিন কাব (রা.)। এরা ছাড়া আরও অনেক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে কুরআন পড়তেন ও শিখতেন, তবে এরা বিশেষ ছিলেন।

মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন ঘোষণার মত করে পড়ার ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ। একদিন সাহাবীরা আলোচনা করছিলেন, কেউ গিয়ে উচ্চস্বরে কুরায়শদেরকে কুরআন শোনানো দরকার। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি গিয়ে শোনাব। সবাই বলেন, তোমাকে কুরায়শরা মারধর করতে পারে, অন্য কেউ যাক। তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ্ বাঁচাবে। পরদিন সকালবেলা তিনি কাবা প্রাঙ্গনে গিয়ে মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সূরা রহমান পড়তে থাকেন। কাফেররা এসে তাকে অনেক মারধর করে, কিন্তু তিনি না থেমে যতটা পড়তে মনস্থ করেছিলেন ততটা পড়ে শোনান। সাহাবীদের কাছে ফিরে আসলে সবাই তার চেহারায় মারধরের ছাপ দেখে বলেন, আমরা তো এই শঙ্কাই করছিলাম। তিনি জবাব দেন, কাফেরদের তিনি কোন পরোয়াই করেন না।

তার ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তাকে নিজের কাছেই রাখতেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সব কাজ করতেন, তাঁকে জুতা পরিয়ে দিতেন, গোসলের সময় পর্দা করে দাঁড়িয়ে থাকতেন, মিসওয়াক-ওযুর পানি- বিছানা বিছানো ইত্যাদি কাজ করতেন। সফরের সময় তাঁর (সা.) নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যেতেন। তিনি আবিসিনিয়া ও মদীনা— দুই হিজরতেই অংশ নিয়েছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর

তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধেও অংশ নেন। বদর যুদ্ধে তিনিই আবু জাহলের শিরোচ্ছেদ করেন, যখন সে চরম আহত হয়ে পড়ে ছিল। মক্কায় মহানবী (সা.) যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের সাথে তাকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন, আর মদীনায় মুআয বিন জাবালকে তার ভাই বানান। একবার মহানবী (সা.) তাকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে বলেন। তিনি বলেন, আমি আপনাকে কী শোনাব? এতো আপনার উপরই নাযিল হয়েছে! মহানবী (সা.) বলেন, অন্যদের কাছ থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। হযরত আব্দুল্লাহ্ পড়তে শুরু করেন, যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছান, "তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব?" তখন মহানবী (সা.) তাকে থামতে বলেন এবং সেসময় তাঁর (সা.) দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল।

হযরত উমরের খেলাফতকালে এক ব্যক্তি কুফা থেকে এসে তার কাছে অভিযোগ করেন, এক ব্যক্তি কুরআন না দেখেই লিখেন। হযরত উমর ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, কে সেই ব্যক্তি? বলা হয়, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ। এটি শুনেই উমর (রা.)-এর রাগ পানি হয়ে যায়। তিনি বলেন, এ কাজের জন্য তার চেয়ে বেশি কাউকে আমি যোগ্য মনে করি না, তিনি এটি করতে পারেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আমরা হযরত হুযায়ফার কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, মহানবী (সা.)-এর সাথে চলাফেরা-অভ্যাস ইত্যাদির দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী কে? তিনি উত্তর দেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ। এ বিষয়টি আরও অনেক সাহাবীও স্বীকার করেছেন। শিরক ইত্যাদির ব্যাপারে চরম ঘৃণা ছিল।

তার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতার সময় হযরত উসমান (রা.) তাকে দেখতে যান। হযরত উসমান বলেন, আপনার কোন অভিযোগ আছে? তিনি বলেন, অভিযোগ আছে আমার গুনাহসমূহের যে আমি এত গুনাহ করেছি। হযরত উসমান বলেন, আপনার কোন কিছু দরকার? তিনি বলেন, আল্লাহ্র রহমত কামনা করি। উসমান বলেন, আপনার জন্য কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা করব কি? তিনি বলেন, ডাক্তারই তো আমাকে অসুস্থ বানিয়েছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতেই আমি খুশি। হযরত উসমান বলেন, আপনার জন্য কোন ভাতার ব্যবস্থা করব? তিনি বলেন, আমার এর প্রয়োজন নেই। হযরত উসমান বলেন, আপনার মেয়েদের কাজে লাগবে। তিনি বলেন, আপনি আমার মেয়েদের অভাবী হওয়ার শঙ্কা করছেন? আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পড়বে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে রোজ রাতে সূরা ওয়াকেয়া পড়বে সে অভুক্ত হয়ে মারা যাবার মত অভাবে পড়বে না। হুযুর (আই.) বলেন, এই ছিল সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের আল্লাহ্র উপর ভরসা ও স্বল্পেতুষ্টির অবস্থা। হিজরি ৩২ সনে তার মৃত্যু হয়। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়ান ও তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। মৃত্যুর সময় বয়স ৬০ বছরের কিছু বেশি ছিল, আরেক বর্ণনানুসারে ৭০এর কিছু বেশি ছিল। তার মৃত্যুর পর হযরত আবু মুসা হযরত আবু মাসউদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি মনে হয়, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদের মত গুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তি আরও অবশিষ্ট আছেন? আবু মাসউদ বলেন, ব্যাপার হল, যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আমাদের আর কারও যাওয়ার অনুমতি থাকত না, তখন তিনি অনুমতি পেতেন। যখন আমরা তাঁর

(সা.) কাছে থাকতাম না, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেবা করতে পারতেন ও তাঁর সাহচর্য দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হতেন। এটি কিভাবে হতে পারে যে তার চেয়ে উন্নত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারে?

হুযূর বলেন, তার সম্পর্কে আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে, পরবর্তীতে সেগুলো বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রদের আদর্শ ও জীবনী অনুসারে চলার তৌফিক দিন। আমীন।

[হুযুরের খুতবা সরাসরি ও সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই]